শ্যামল কিমাছে

লিখেছেন

বিমান বসু অশোক ভট্টাচার্য সুদর্শন রায়চৌধুরি
নেপালদেব ভট্টাচার্য সোমনাথ ভট্টাচার্য সারণ দত্ত
উষসী চক্রবর্তী শময়িতা চক্রবর্তী অর্ক রাজপন্ডিত
আশিস চট্টোপাধ্যায় আজিজুল হক

আমাদের কথা

খুব খুব প্রয়োজন না থাকলে বেরোবেন না শ্যামলদা । বলতাম আমরা।

জানি ঘরের ভেতরে আটকে থেকে দিনের পর দিন বইয়ের পাতায় মুখ ডুবিয়ে রাখা আপনার পক্ষে কার্যত বন্দীত্ব।

কিন্তু আপনার কাছেই শুনেছি অস্থির সত্তরে অজ্ঞাতবাসে, শাসকের সতর্ক চোখ এড়িয়ে অন্তরীণ থেকেছেন ।

আড়ালে থেকে প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করেছেন। এক দীর্ঘ গণসংগ্রামের পরিপূর্ণ বিজয়ের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে বই লিখবেন এমনটাই ভাবনা ছিল। সেই সব দিনগুলোর কথা মনে রেখে এখন না হয় ক'টা দিন বাড়িতেই ..।

জানেনই তো আপনার ফুসফুস বাতাস গ্রহণ করতে পারছে না সহজ স্বাভাবিকভাবে। জীবনের বড় একটা সময় নানা ঝড় ঝাপটা গেছে শরীরের ওপরে। ছায়ামাখা স্থির শান্তির ফুল-বিছানো পথ দিয়ে নয় ষাট সত্তরের বাম ছাত্র আন্দোলনের দাবানলের তীব্রতাকে শরীরে জড়িয়ে পথ হেঁটেছেন। শরীর ভেঙেছে কিন্তু পথ চলা থামেনি। এখন ক'টা দিন না হয় সাবধানে ...।

হাসতেন। তারপরেই কথা ঘোরাতেন। শরীর নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা তাঁর বরাবর না-পসন্দ! তার চেয়ে ঢের বেশি ঔৎসুক্য আগামীদিনের লড়াইয়ের পরিকল্পনায়। ঘরবন্দী থেকেও সকাল বিকেল ফেসবুকে পোস্ট করতেন সাম্প্রতিক বিষয়ে। বামপন্থীদের, মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে কুৎসাকে খণ্ডন করতেন তীক্ষ্ণ পরিশীলিত ভাষায়। সাতাশে জুলাই পর্যন্ত।

আর করবেন না। লিখবেন না, বলবেন না, ভাববেন না। কিন্তু ভাবাবেন। লক্ষ অযুত মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীতে অত্যন্ত গভীরভাবে মিশে থাকবেন।

শুধু শোকে-দুঃখে নয়, সংগ্রামে শপথে।

অমলিন থাকবে তাঁর স্মৃতি সেই সব মানুষের কাছে যাঁরা মানুষকে ভালবেসে, পৃথিবীকে ভালবেসে শুভ-সুন্দর ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণময় এক নতুন পৃথিবী গড়ার সংগ্রামে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। কেউ অতীতে, কেউ আজীবন, কেউ বা অতি সম্প্রতি।

এঁদের বলা কিছু টুকরো কথা নিয়েই আমাদের এই সংকলন।

লিখেছেন

লড়াই আন্দোলনের মধ্যেই বেঁচে থাকবে
বিমান বসু ৫

ছাত্র আন্দোলন থেকে শ্রমিক আন্দোলন,
অনন্য নেতৃত্ব শ্যামলদা
অশোক ভট্টাচার্য ৯

শ্যামল কিনারে
সুদর্শন রায়চৌধুরি ১২

তত্বকে পরিণত করো সত্যে, শিখিয়েছেন শ্যামলদা
নেপালদেব ভট্টাচার্য ২০

বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে
সোমনাথ ভট্টাচার্য ২৩

কাপ্তান সাহেব, আপনাকে
সারণ দত্ত ২৭

বিদায় বলবো না
উষসী চক্রবর্তী ২৯

জীবনরসিক
শময়িতা চক্রবর্তী ৩১

শ্যামলদা এক আশ্চর্য বেঁচে থাকা
অর্ক রাজপণ্ডিত ৩৩

দেহমৃত্যু অনিবার্য, বেঁচে থাকে কারও কারও ভাবনাধারা
আশিস চট্টোপাধ্যায় ৩৭

ধোয়াঁশার মধ্যে যে শ্যামল উজ্জ্বল
আজিজুল হক ৪০

লড়াই, আন্দোলনের মধ্যেই বেঁচে থাকবে

বিমান বসু

কমরেড শ্যামলের চলে যাওয়া ব্যক্তিগতভাবে শুধু আমার কাছে নয়, আমাদের পার্টিরও ক্ষতি। একজন দক্ষ, জনপ্রিয় সংগঠক ছিল।

লড়াই সংগঠনের প্রতি স্তরে যেমন যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে, তেমনই আবার পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে পরিষদীয় রাজনীতিতেও স্বাক্ষর রেখে গেছে কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী।

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দীনেশ মজুমদার, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল ও আমি, সেই সময় আমরা একটা ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে ছিলাম। তা একদিকে যেমন ছিল প্রবল রাজনৈতিক, একইসঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভূতি, ঘটনাও আমরা একে অপরকে বলতাম। শ্যামল-সুভাষ একসঙ্গে অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল। ওদের ওই সম্পর্ক শুরু হয়েছিল দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্টদের এগতে হয়।

কমরেড শ্যামলের ব্যবহার, ওঁর কথা বলার ধরনের কারণেই হয়তো কেন জানি আমার মা খুবই পছন্দ করতেন ওঁকে। মা যাদের খুব ভালোবাসতেন, একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী।

আজকে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একবার আমাদের বাড়িতে অনেকে গেলেন আমার সঙ্গেই। বাড়িতে কোনও একটা অনুষ্ঠান ছিল, এখন মনে পড়ছে না। খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। মা পায়েস করেছিলেন। অন্যান্য খাওয়া হয়ে গেলে মা সবাইকে পায়েস খেতে

দিয়েছেন। কাউকে ছোট বাটিতে, কাউকে মাঝারি বাটিতে। তো শ্যামল খাওয়া শেষ করেই মা'কে বলল, 'মাসিমা পায়েস কি শেষ হয়ে গেছে, নাকি একটু আছে বেঁচে?' মা বুঝলেন ও কী বলতে চাইছে। আবার দিলেন পায়েস। খুবই তৃপ্তি করে খেত শ্যামল।

পার্টি, গণসংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমরা বিভিন্ন সময়ে একসঙ্গে গিয়েছি। শ্যামলের একটা বড় গুণ ছিল– যেমন দক্ষ সংগঠক ছিল, যেমন বক্তৃতা করতে পারতো। তেমনি ছিল ওঁর লেখার হাত। আমি মনে করি, শ্যামল যদি শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চাই করত, তাহলে বড় মাপের একজন সাহিত্যিক হতে পারত। একাধিক রাজনৈতিক বিষয়ে ও যেমন প্রবন্ধ লিখত বিভিন্ন পার্টি পত্র-পত্রিকায়, পরে সেই প্রবন্ধকে আরেকটু বাড়িয়ে, গুছিয়ে সেটা বই আকারেও লিখত। ওঁর শব্দ চয়নে অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। কাশ্মীর বিষয় থেকে ভারতের জাতি, বর্ণ এবং ধর্মীয় বিভাজনের সামাজিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছে। পরে সেগুলি আবার বই আকারেও প্রকাশ করেছে। গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক লেখায় পারদর্শিতা ছিল। আরও একটা বিষয় ছিল, তা হলো ওঁর লেখায় আবেগ থাকতো। যে কোনও লেখার সঙ্গে যুৎসই কবিতার লাইন যুক্ত করে তাকে যথাযথভাবে উপস্থিত করার দক্ষতা ছিল কমরেড শ্যামলের।

ছাত্র আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট নেতা ছিলেন কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গে ষাট ও সত্তর দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী। যাত্রা শুরু হয়েছিল দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে। তারপর কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ। সেখানে তখন ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সকল ছাত্রের ভোটে সরাসরি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন হতো। শ্যামল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল কলেজে। দমদম এলাকায় পার্টির কাজেও যুক্ত ছিল। শ্যামল চক্রবর্তীর আদিবাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। পরে একাধিক জায়গায় বদল হয়, চাকদহ-কৃষ্ণনগরেও ছিল এক সময়। শ্যামলের দমদমের নলতার বাড়িতে একবার রাতে ছিলাম। তখনই দেখেছিলাম খুব

কষ্ট করে বড় হয়েছে শ্যামল। শ্যামলের মায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝেছিলাম একসময় দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেই শ্যামল স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছে।

শ্যামল তখনকার ২৪ পরগনার দমদম এলাকায় পার্টির কাজকর্ম করেই পার্টি সদস্যপদ অর্জন করেছিল কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে সদস্যপদ কলকাতা জেলায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে শ্যামল কলকাতায় পার্টির জেলা কমিটির ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হয়েছিল।

পরে ১৯৮১ সালে মানিকতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়। সুহৃদ মল্লিক চৌধুরীর মৃত্যুর পরে উপনির্বাচন হয়। ও জয়লাভ করে। শুরু হয় পরিষদীয় রাজনীতির জীবন। ১৯৮২ সালে ফের ভোটে জেতে, তারপর ৮৭ সালেও জয়ী হয়। ২০০৮ সালে কমরেড শ্যামল রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিল। ওঁর রাজনৈতিক জীবন বর্ণময় ছিল। গণআন্দোলনের অগ্রণী নেতাই শুধু নয়, ছিল ভালো লেখকও। কবিতাও পাঠ করত এবং সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত রেখেছিল।

ওঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুধাবিস্তৃত ছিল। ছাত্র-যুব আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনে গৌরবময় ভূমিকা ছিল। পরিবহণ ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ শিল্পের আন্দোলনে কমরেড শ্যামলের গৌরবজনক ভূমিকা ছিল। ছাত্র আন্দোলনের পর কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন গঠন, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সহসভাপতি ও সভাপতি হিসাবেও দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শ্রমিক আন্দোলনে।

১৯৭৩ সালে শ্যামল চক্রবর্তী এসএফআই'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন। এসএফআই'র সর্বভারতীয় স্তরেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। ১৯৭৮ সালে রাজ্য সম্মেলন থেকে শ্যামল চক্রবর্তী পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। ২০০২ সালে হায়দরাবাদ পার্টি কংগ্রেসে শ্যামল চক্রবর্তী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

সদস্য ছিলেন।

ওঁর কন্যার প্রতি সমবেদনা জানাই। বুয়ার কাছে এটা বড় ক্ষতি। বুয়ার ভালো নাম উষসী। খুব কম বয়সে ও মাকে হারায়। ১৯৮২ সালে কমরেড শিপ্রা ভৌমিকের মৃত্যু হয়। আজকে বাবাকে হারালো।

এই বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ওঁর মৃত্যু আমাদের সকলের কাছে একটা ক্ষতি। কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী লড়াই আন্দোলনের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন।

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী লাল সেলাম।

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী অমর রহে।

ছাত্র আন্দোলন থেকে শ্রমিক আন্দোলন, অনন্য নেতৃত্ব শ্যামলদা

অশোক ভট্টাচার্য

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী চলে গেলেন। আমরা হারালাম আমাদের অন্যতম এক অভিভাবককে। তাঁর মৃত্যু মানে একটা যুগের অবসান। যিনি ছিলেন ছাত্র আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের এক অবিসংবাদিত নেতা। লড়াই করেও মৃত্যুর কাছে তিনি হেরে গেলেন। অথচ এই শ্যামলদা একসময় আরও অনেক জটিল রোগকে হারিয়ে তিনি আবার স্বাভাবিক কাজ, সংগঠন, আন্দোলন, মন্ত্রী বা সংসদের কাজ সামলিয়েছেন।

আমরা দেখতাম তাঁর চলাফেরাতে কত অসুবিধে ছিলো কিন্তু তাঁর এমন জেদ ছিলো এতো অসুবিধের মধ্যেও তিনি উত্তরবঙ্গে আসতেন, আর আসতেন শিলিগুড়িতে। সেই যখন বিপিএসএফ'র নেতা ছিলেন, তখন যেভাবে দেখেছি, পরিবহন মন্ত্রী বা সিআইটিইউ নেতা হিসেবে একই ভাবে দেখেছি। আবার কোনো পদে না থেকেও শ্যামলদা ছিলেন শ্যামলদাই।

আমার সাথে শ্যামলদার পরিচয় হয় ১৯৬৯ সালে ছাত্র ফেডারেশন করতে গিয়ে। সেই সময় আমাদের যেমন মতাদর্শ গত লড়াই করতে হতো, সেই লড়াই কখনো কখন শারীরিক লড়াইতে পরিণত হতো। আমাদের সব চাইতে বড় হাতিয়ার ছিলেন দুজন সুভাষদা আর শ্যামলদা। আর দেখেছি একজনকে যিনি ছিলেন আমাদের সকলের অভিভাবক তিনি দীনেশ মজুমদার। ছাত্র সংগঠন এর কাজের

পরিকল্পনা করতেন বিমানদা। সেই সময় ছাত্র ফেডারেশনের দার্জিলিং জেলা সংগঠন একে বারেই ভেঙে গিয়েছিলো। সুভাষদা এসে আমাদের কয়েক জনকে নিয়ে নতুন করে বিপিএসএফ গড়ে তুলবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দার্জিলিং জেলাতে নতুন করে ছাত্র ফেডারেশন গড়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে বিপিএসএফ এর উনিশ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়ে ছিলো আমাদের। আমরা অনেক বাধার মধ্যে ঐ রাজ্য সম্মেলন সফল করেছিলাম। যতদূর মনে পরে ঐ সম্মেলন থেকে সুভাষদা আবার সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছিলেন শ্যামলদা। ছাত্র আন্দোলন করতে গিয়ে শ্যামলদার ভাষণে আর সুভাষদার লড়াকু ও সাহসিক ভূমিকায় আমরা ভীষণ উজ্জীবিত হতাম। সেই সময় আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, অনিল বিশ্বাস, নিরুপম সেন, উত্তর বঙ্গ থেকে জ্যোতিষ ভৌমিক আর জীবন মৈত্র। এঁরা আজ আর কেউ জীবিত নেই। এখন যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুদর্শন রায়চৌধুরী। শ্যামলদা তাঁর একটি বইতে এসব ইতিহাস লিখে গেছেন।

শ্যামলদার জীবনের যে বৈশিষ্ট্যটা আমাদের অনেকের কাছে সব চাইতে বেশী আকর্ষিত করতো তা হলো সেই ছাত্র সংগঠন করতে গিয়ে দেখেছি, শ্যামলদার বন্ধু ছোট বড় সবাই। কী হাল্কা ছলে, সহজ ভাবে, গল্প করে সবার সাথে কথা বলতেন আর, হাসাতেন আমরা কোনোদিন তা ভুলবো না। শ্যামলদা যেমন মন খোলা মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন শিপ্রাদি, তাঁর স্ত্রী, কী ভাবে হটাৎ করে তিনিও চলে গেলেন, সেই দিনটির কথাও ভুলতে পারবো না। জটিল রোগ থেকে শ্যামলদার কাঁধ ঝুকে গেছিলো ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিক বা নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে তাঁর মাথা কেউ ঝোঁকাতে পারেনি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। শ্রমিক নেতা হিসেবে একটু অন্য ধরণের নেতা ছিলেন তিনি। তিনি সব চাইতে গুরুত্ব দিয়েছিলেন অসংগঠিত ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষদের সমস্যা ও দাবি নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও নগর জীবনের দ্রুত পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি প্রচুর গবেষণা ধর্মী বই পড়তেন বা ভাবনা চিন্তা করতেন। উত্তর বঙ্গের জাতি,জন

জাতি , ভাষা, উপভাষা নিয়ে জানতে তিনি ছিলেন খুবই আগ্রহী। একই ভাবে তিনি ভাবতেন চা শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়ে, বিশেষ ভাবে এঁদের সামাজিক সমস্যা নিয়েও তিনি ভাবতেন। তিনি ছিলেন একজন সুলেখক, প্রাবন্ধিক। তাঁর ভাষা চয়ন ও সৌন্দর্য বোধ ছিলো শিক্ষণীয়। উত্তর বঙ্গের মানুষের প্রতি তাঁর ছিলো অকৃত্তিম ভালোবাসা। আর ভাবতেন তরুণ প্রজন্ম কে নিয়ে। মৃত্যর কয়েক দিন আগে বেশ কয়েকবার আমাকে টেলিফোনে এসব বিষয়ে তাঁর কিছু মতামত দিয়ে ছিলেন। আমি করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে আসার জন্যে আমাকে শ্যামলদা অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন, তিনি যখন অসুস্থ হলেন আমাদেরও আশা ছিলো এক লড়াকু নেতা লড়াই করেই ফিরে আসবেন। শ্যামলদা চলে গেলেন, হেরে গেলাম আমরা। কমরেড শ্যামলদা লাল সেলাম।

শ্যামল-কিনারে

সুদর্শন রায়চৌধুরী

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য সিআইটিইউ'র সর্বভারতীয় নেতা এবং ক'দিন আগেও বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশনস (বিপিএমও বলে সমধিক পরিচিত)-এর আহ্বায়ক এই সব পরিচিতি অনেক দিনের পোড়-খাওয়া ধাপে ধাপে দায়িত্ব বাড়া একজন রাজনৈতিক নেতার স্মারক। সদ্য প্রয়াত কমরেড শ্যামল চক্রবর্তীর এই পরিণত বয়সের অভিধা ও তৎপ্রসূত ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ডের পরিধির যথাযথ মূল্যায়ন করার কোনো সঙ্গত অধিকার আমার নেই। তবু এই পরিণত কমরেড শ্যামলের সান্নিধ্য কিছুটা পেয়েছি দুটি সীমিত ক্ষেত্রে – এক বিপিএমও-র নেতা হিসাবে দুটি বিশাল পদযাত্রার মুখ্য আহ্বায়ক ছিল কমরেড শ্যামল। বিভিন্ন গণসংগঠনের সম্মিলিত মঞ্চ বিপিএমও-র নেতৃত্বে এই দুটি পদযাত্রাই আমাদের হুগলী জেলার প্রায় ৫০-৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে শ্রমজীবী মানুষের নানান জরুরি দাবি তুলে। পদযাত্রার তাৎপর্য কী, পরিকল্পনা কী তা কমরেড শ্যামল আমাদের কর্মীদের বুঝিয়েছে। কিন্তু কখনই এমন কোনো দাবি করেনি যা আমাদের সাধ্যের বাইরে। শারীরিক কারণেই এই বিশাল পদযাত্রার সর্বত্র সে যোগ দিতে পারেনি। কিন্তু মাঝে মাঝেই এবং অবশ্যই দিনান্তে খোঁজ নিয়েছে সকলের সুবিধা অসুবিধার কথা, উৎসাহ যুগিয়েছে এবং আমাদের কর্মীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

(প্রসঙ্গত বলি কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। কিন্তু তাকে আমি কখনই 'দাদা' বলে ডাকিনি। 'আপনি আজ্ঞেও' করিনি। এই কৈফিয়তটা মাঝপথে দিলাম এই জন্যে যে তার সম্পর্কে যে সম্বোধনবাচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ আমি ব্যবহার করছি তাতে কেউ যেন ভুল না বোঝেন।)

যে পরিণত শ্যামল শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা তারও কিছুটা ছোঁয়া দেখেছি আগামীদিনের শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় একটি বিষয়ে আমাদের শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক কিছু দুর্বলতা নিয়ে তার উৎকণ্ঠায়। দেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৯৪ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই যে শহরে কর্মরত তা নয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষির সুযোগ ও সম্ভাবনার সীমাবদ্ধতা, জমির মালিকানা থেকে বঞ্চনা এবং খেতমজুর হিসাবেও কাজের দিন ক্রমশ কমে আসার ত্রিমুখী কারণে অনেকেই নানান ছোটোখাটো কাজে লাগতে হয়। মনরেগার কাজও তো মেলে না, টাকা বকেয়া থাকে। তাই অগত্যা ভ্যান চালানো বা শহর থেকে আনা নানান পশরা বিক্রিবাট্টা করে খেটে খেতে হয়। এরা অসংগঠিত শ্রমজীবীর গ্রামীণ অংশ। কমরেড শ্যামল অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তোলপাড় করে বেরিয়েছে সর্বত্র। এই দেখেও না দেখা মেহনতীদের সংগঠিত করার জন্যে তার সচেতন চেষ্টা সর্বাংশে যে ফলপ্রসূ হয়েছে তা সবটা বলতে পারবো না। কিন্তু এই প্রয়াস যে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের নজর টানতে পেরেছে তা সত্য।

কমরেড শ্যামলকে আমি এই দিক থেকে জানলাম কি করে? এর কারণ ছিল রাজ্য পার্টির অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের জেলার পার্টি সংগঠন পরিচালনায় সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন তাকে পেয়েছিলাম। বিশেষত জেলার শ্রমিক ফ্রন্ট পরিচালনায় সে বরাবর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছে। ঘটনাচক্রে জেলার সভায় তার আসনের ঠিক পাশেই আমার আসন ছিল। জনান্তিকে নিচু গলায় সে সভার গতিপ্রকৃতি বুঝতে চাইত। দরকার পড়লে সোচ্চারেই যা মন্তব্য করতো তাকে মান্যতা দিতে কেউ দ্বিরুক্তি করেননি।

প্রসঙ্গত কমরেড শ্যামলের আহারবিলাসিতা আমি ছেলেবেলা থেকে জানতাম। সভাও শুরু হয় সকালবেলায়। তাই সে যাতে তৃপ্ত হয়ে ফিরতে পারে সে জন্য প্রস্তুতি রাখা হত। আহার শেষের তৃপ্তির আলোয় শ্যামলের মুখ দেখে উপস্থিত সব কমরেডই খুশি হতেন।

এই শ্যামল পরিণত মন ও বয়সের অগ্রণী পার্টিনেতা। সেই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের এক ডাকসাইটে নেতা। তার কাজের এই বৃহত্তর বৃত্তের নাগালে আমি কখনও তেমন ছিলাম না। রাজ্য কমিটির সভায় একটুআধটু দেখা, চকিত মন্তব্যের আদান-প্রদান, সামান্য আলাপ এটুকুই যা। কখনো সখনো ফোনে এটা-ওটা নিয়ে মূলত বিশ্রম্ভালাপ – ব্যাস।

আমি শ্যামলকে চিনি সেই গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মোটামুটি মাঝামাঝি সামনে থেকে। ১৯৬১-তে স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে মৌলানা আজাদ কলেজে আমি পড়তে যাই। প্রি-ইউনিভার্সিটি সায়েন্স ক্লাশে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে কমরেড বিমান বসু আমাকে শ্রেণিপ্রতিনিধি হিসাবে ছাত্র ফেডারেশনের প্রার্থী করেন। কেউ রাগ করবেন না যদি বলি, তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেদের বামপন্থী না হয়ে গত্যন্তর ছিল না। আমি সেই ছেলেমেয়েদের কথা বলছি যারা সমাজ নিয়ে একটু ভাবত, দেশের কথা ভাবত, পাঠ্যক্রমের বাইরেও গল্প, কবিতা, উপন্যাস পড়তে যেত পাড়ার ভেতর বা অনতিদূরে লাইব্রেরিতে আর তেমন হাতিঘোড়া উচ্চাশাও যাদের ছিল না। বামপন্থাকেই আশালতা করে তারা জীবনে বেড়ে উঠতে চাইত। অতি বড় দুঃস্বপ্নেও দক্ষিণপন্থাকে বেছে নিত না। দেশ ছিল এমন, সময় ছিল এমন যাকে সুধীন দত্ত বলেছিলেন ‘অশ্লেষার রাক্ষসীবেলা’ একদিকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-দেশভাগের নির্মম উত্তরাধিকার অন্যদিকে বামপন্থী নেতাদের কৃচ্ছ্র দিনযাপন, সেলুলার জেলের বন্দিতালিকায় কমিউনিস্টদের সংখ্যাধিক্য – অল্প বয়সী ছাত্ররা অমোঘ আকর্ষণে ছুঁতে চাইত বামপন্থীদের। আমিও যে বিমানদার কাছে গেছিলাম তা নিজে থেকে, উনি ডাকেননি। ডাক আসলে সেই সময়ের ডাক। তা সেই আমার অনুষ্ঠানিক দীক্ষা ছাত্র ফেডারেশনে। পরে চলে যাই বিএসসি পড়তে প্রেসিডেন্সিতে। কিন্তু সেখানে বামপন্থীদের

মিললেও ছাত্র ফেডারেশনের কিছু দেখিনি। উত্তর কলকাতার শহরতলীতে আমাদের বাড়ির পাড়ায় যোগাযোগ হলো কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। সিপিআই(এম)। পরে কাঠখড় পুড়িয়ে সদস্যপদও জুটল। এরই মধ্যে দিনক্ষণ অত মনে নেই, কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে হলো আন্দোলন। কিছু আগে পরে খাদ্য, বই-কাগজ ও তেলের দাবিতেও রাজ্য জুড়ে আন্দোলন। সময়ের দিক থেকে কোনটা আগে কোনটা পরে খেয়াল নেই। প্রেসিডেন্সিতে আমরা অনেকে ছিলাম বামপন্থী – নিজেদের সংজ্ঞামত এসএফও। কলেজের কংগ্রেসভুক্ত ও উন্নাসিক ভুঁইফোঁড় কিছু ছেলেরা (যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনেকের সঙ্গে সখ্যতা ছিল) চীন-ভারত সীমান্ত সংঘাতের সময়ে পারলে আমাদের ছিঁড়ে খেত। এর প্রতিবাদ আমরা করেছি।

তবে এসএফ তো ছিল অসংগঠিত। সুতরাং সব সময়ে মূল ফটকের সামনে না হলেও হেয়ার স্কুলের সামনে, অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহচরদের সঙ্গে মিলে ট্রাম বা খাদ্য আন্দোলনে অনেকেই ভিড়ে যেতাম। এভাবেই বিপিএসএফ-এর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। বিমানদাকে তো আগে থেকেই চিনতাম। দীনেশদা, সুবিনয়দা, সুভাষদা, বিমলদা, শ্যামলী, শিপ্রা, রমলা, সুরেন্দ্রনাথ থেকে আসা বাসব-অচিন্ত্য-অজয়। স্কটিশ, বঙ্গবাসী, মণীন্দ্র, জয়পুরিয়ার কমরেডরা এবং আরও এখান-ওখান থেকে একের পর এক ঝাঁক এসএফ কর্মী, নেতাদের সঙ্গে আমাদের ক্রমশ আলাপ হয়ে গেল। শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক, পল্লব গোস্বামী এবং নির্মল ব্রহ্মচারীর সঙ্গেও আমরা ভিড়ে গেলাম ক্রমশ। নির্মলের সঙ্গে আমি ক্লাশ সিক্স থেকে মেট্রোপলিটনে (ক্রিক রো) পড়েছি। খুব ভালো ছেলে। প্রাণঢালা ভালোবাসা আমাদের। পল্লবও একান্ত ছেলেবেলার বন্ধু। প্রেসিডেন্সির আপনজনদের মধ্যে ছিল অসীম, লামা (অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির ছেলে), ছটু (কৃষ্ণবিনোদ রায়ের ছেলে)। মৃণালিনী দাশগুপ্তের নাম খুব শুনেছি। তার দুই ছেলে ছটু-বেটু, অসীম ও অতীশ, সুভাষ চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব এবং আরও অনেকে। বুদ্ধদেব তখনই সম্ভবত ‘পদ্মানদীর মাঝি’র নাট্যরূপ দিয়ে ফেলেছে। আমার

নিজের বিএ ক্লাশের সুদীপ্ত (কবিরাজ) ও শোভনলাল (দত্তগুপ্ত) এরা সবাই। এরা আন্দোলনে কেউ উৎসুক, কেউ আগ্রহী, কেউ দরদী, কেউ বামপন্থীমনস্ক হলেও সক্রিয় নয় তেমন। কত নাম বাদ পড়ে গেল। তালিকা ছাড়ি।

কিন্তু এতজনের মধ্যে একজন ঝাঁপিয়ে পড়া – সদাহাসিমুখ, সর্বদা টগবগে, মুখে খইফোটা আর ভারি সুন্দর দেখতে নেতা খুব নজর টানল। সত্যি কথা বলি? নজর নয় মন টানল। সে প্রচণ্ড হৈ হৈ করে, হুল্লোড় ভালোবাসে, রাজনৈতিক তর্কে জুড়ি নেই, নিমেষে বন্ধুত্ব পাতায়, বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ে ও ছাত্র ফেডারেশনের রীতিমত নেতা, তার সাহিত্যবোধ আছে, আমাদেরই দু'চারজনের মতো সিনেমার নাইট শোয়ের পোকা এবং সুচিত্রা সেনের অসীম অনুরক্ত – সে কদিন আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে ১০ জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে রাজ্য কমিটির সভায় আমার সামনের সারিতে বসা, অবিন্যস্ত চুলে মুখে হাসি ও দুষ্টুমি নিয়ে অনেক কথা বলছিল – আমার উদ্দেশে যে সব সময় তা নয়, আরও অনেকে তাকে ঘিরে রাখে – কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী।

বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে ষাটের দশকে যে কয়েকজন নেতার নাম সবাইয়ের মুখে মুখে থাকত তাঁদের সারিতে ছিল কমরেড দীনেশ মজুমদার, সুবিনয় ঘোষ, বিমান বসু, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নদীয়া থেকে আসা অনিল বিশ্বাস এরাই ছিল নক্ষত্র। দীনেশদা, সুবিনয়দা ১৯৬৭-র পর অন্য দায়িত্বে চলে যাওয়ায় বিমানদা-সুভাষদা-শ্যামলই যেন আমাদের বিপিএসএফ-এর স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি লেখা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়ার আগুয়ান সারিতে। বিমানদার তো তুলনা নেই, আমাদের সবাইয়ের কথা শুনতেন, আমাদের মত সিগারেটখোর ছিলেন না, লঘু পরিহাসে ঠোঁটের কোণে শুধু হাসিটা ঝুলতো, সুভাষদার সিংহহৃদয় ও প্রবল সাহস। আর শ্যামল? অতশত বুঝি না – এমন বন্ধু আর কে আছে!

আসলে শ্যামলেরা এক বিশেষ সময়ের সন্তান। একের পর এক আন্দোলন সেদিন আছড়ে পড়েছিল পশ্চিমবাংলায়। প্রেসিডেন্সির ছাত্র বহিষ্কার নিয়ে চার মাস জুড়ে আন্দোলন। সেখানে সমর্থন

জানাতে এলেন ট্রাম শ্রমিকেরা। এসেছিলেন উৎপল দত্ত। আসবেন না কেন? মিনার্ভায় ‘কল্লোল’ হতে দেবে না সরকার। বড় কাগজ বিজ্ঞাপন নেবে না। আমরাই ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে সেঁটেছি পোস্টার – ‘কল্লোল চলছে চলবে’। শ্যামলের সঙ্গে মিনার্ভায় গেছি কতদিন। পাছে গুণ্ডারা হামলা করে নাটকের ওপর।

বিশ্বব্যাঙ্কের ম্যাকনামারা আসবে কলকাতায়। তাকে নামতেই দেব না আমরা। সে যেন জোয়ার। শ্যামল আর সুভাষদা দমদমের অলিগলি চেনে। ওরাই দেখিয়ে দেয় কাঁদানে গ্যাসের হামলায় কোথায় একটু সিঁধিয়ে যাবো, ফের বেরোবো। সেদিন ম্যাকনামারা কলকাতায় ঢুকতেই পারেনি।

প্রথম কে তুলেছিল সেই স্লোগান – ‘তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম’? জানিও না। তবু মনে আছে দিনের পর দিন ধর্মতলায় ইউসিসের দপ্তরের সামনে মিছিলের ঢেউ উঠছে। শ্যামলের কোত্থেকে পাওয়া একটা মধুর স্লোগানে গলা মিলিয়েছি – ‘লাল কিল্লা পর লাল নিশান মাঙ রহা হ্যায় হিন্দুস্তান’। সে স্লোগান ছড়িয়ে পড়ল মিছিলের শেষ প্রান্তেও।

১৯৬৭। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার হলো। কেউ ভাবিওনি। শুরু হলো ষড়যন্ত্রও। রাজ্যপাল আর কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে সে সরকার ভেঙেও পড়ল সে বছরই নভেম্বরে। শুরু হলো আইন অমান্য। দলে দলে ছাত্ররা এসপ্ল্যানেড ইস্টের দিকে। পুলিশ মার দেয়। জেলে যায় অনেকে। ফের মিছিল। ফের পুলিশের মার। (প্রসঙ্গত বিমানদাকে দেখতাম সর্বত্রই প্রায় সর্বদাই যেন পুলিশের নরম লক্ষ্য। ওকে মারবেই। বিমানদাও অকুতোভয়)। শ্যামল একদিনে হঠাৎ মতলব দিল চলো শ্যামবাজার মোড়’। পুলিশ ঘাবড়ে যাবে। গেলাম। এবং সংঘর্ষ। কোন ফাঁকে পুলিশ হাজির।

১৯৬৭-র মে দিবস। ব্রিগেড সমাবেশ। বক্তা সম্ভবত বিটি রণদিভে। আমরা যাবো। আমরা যাবো। আর সেদিনই নকশালপন্থীরা নতুন পার্টি গড়বে – সিপিআই(এম-এল)। শুরু হলো আমাদের মিছিলে হামলা। কতজন যে আহত হলো। তবু আমরা গেলাম ব্রিগেডে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে নতুন লড়াই – সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে

আমরা তো লড়াইয়ে অভ্যস্ত, এবার সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে। এ লড়াই মতাদর্শগত। শ্যামল রাজনৈতিক বক্তব্যে তুখোড়। এবার তাহলে সবাই পড়ো, তর্ক করো, আর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে লড়ো। সে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। সবখানে।

ইতিমধ্যে ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা জেলা সম্মেলন। গিরীশ পার্কের পাশে হরিয়ানা ভবনে। নকশালরা মিছিল নিয়ে হামলা করলো। আমরা তাড়িয়ে দিলাম। বৌবাজারে বিপিএসএফ অফিসের দখল নিতে ওদের মিছিল করে হামলা। তা-ও রুখেছি। সর্বত্র শ্যামল সামনেই। এবং বোমার ধোঁয়ার ভেতরে একটু ফাঁক পেলেই মুখে ছোঁয়াচে হাসি।

এল শ্রীরামপুরে রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলন শুরু ঠিক আগের রাতে আমরা শ্যামলসহ কয়েকজন কমরেড কলকাতা জেলা পার্টি অফিসে হলঘরে শতরঞ্জিতে শুয়ে গল্প করছি। এমন যে কত রাতই গেছে! হঠাৎ ফোন এলো। হুগলীর নেতা দিলীপ বিশ্বাস ফোনে বলল, সর্বনাশ। নকশালপন্থী কয়েকজন নেতা এমন সব গোলমাল পাকিয়েছে যে সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি রীতিমত বিপন্ন। কী করা যায়? ষড়যন্ত্র এতদূর যে কলকাতা থেকেও নকশালপন্থী ছাত্রনেতা সেখানে হাজির। শ্যামল দু'মিনিটও অপেক্ষা করল না, ফোনে বলল, ওরা আমাদের সংগঠনের কেউ আর রইল না, এখনি বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে, সম্মেলন হবেই। ফোন নামিয়ে বলল, আর বিকল্প ছিল না। এবার প্রশ্ন করল – ঠিক বলেছি তো? বলা বাহুল্য এ প্রশ্নে আনুষ্ঠানিক। এই যে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া, তিলেক বিলম্ব না করা – এই গুণটা শ্যামলের ছিল। তাই সে অত বড় নেতা হয়ে উঠেছিল।

কত কি-ই যে মনে পড়ে! জয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধর্মঘটের গেটে দিনের পর দিন আমরা সামিল। ইলাকোয় অটোমেশনের বিরুদ্ধে রাত জেগে অবস্থান। স্টেটসম্যানের সাংবাদিক ও কর্মচারীদের সমর্থনে দপ্তরে অবস্থান। সর্বত্র ছাত্ররা। সর্বত্র শ্যামল। হাসিমুখ। মনে হয় তখন এমন দিন যেন ছিল না আমরা শ্যামলের সঙ্গে মিছিলে হাঁটিনি, স্লোগান তুলিনি, স্বপ্ন দেখিনি, মনের কথা উজাড়

করিনি। মনে পড়ে কত রাতে শিয়ালদা থেকে ট্রেনে একসাথে ফিরতাম। আমি দমদম জংশনে নামবো। যাবো চিড়িয়া মোড়ে। ও ক্যান্টনমেন্টে এগিয়ে যাবে। গল্পের শেষ নেই যেন।

সেই আমাদের কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী চলে গেল। আজকের সময়ও অস্থির। সেদিনও ছিল অস্থির। দুই অস্থিরতার ফারাক আছে অনেক। তবু তো এগোতে হবে। শ্যামলের সাহিত্যে অনুরাগ ছিল ভারি। তার কি আজ মনে পড়ত না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা? ...‘সব আরম্ভেরই একটা শেষ আছে, সব শেষেরই একটা আরম্ভ/ একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে’।

তত্ত্বকে পরিণত করো সত্যে, শিখিয়েছেন শ্যামলদা

নেপালদেব ভট্টাচার্য

আমার সঙ্গে শ্যামল চক্রবর্তীর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৬৭সালে। ১৯৬৬খাদ্য আন্দোলনে অল্প যুক্ত হয়েছিলাম তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। ১৯৬৭সালে কলকাতায় এসে ৯৩/১এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট যেখানে বিপিএসএফের অফিস ছিল, তিন জন নেতা ছিলেন– শ্যামল চক্রবর্তী, সুদর্শন রায়চৌধুরী, আশীষ দে। সেখানেই পরিচয় হয় শ্যামলদারসাথে। কি নাম, কোথায় পড়ি, ছাত্র ফেডারেশন করি কি না তাই জেনেছিলেন। সেটা শেষ দিন পর্যন্ত দেখেছি অন্যের কথা শোনার অভ্যাস যখন অনেকের থাকেনা শ্যামলদা কিন্তু বরাবর সে অভ্যাস ছিল।

ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুভাষদা, শ্যামলদা। তাঁরা যে পথে হেঁটেছিলেন তাঁদের পেছনে আমরাও হেঁটেছি হাজারে হাজারে। খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যারা সেদিন পথ হাঁটা শুরু করেছিল, আজ তাদের বড় অংশই রাজ্যের গণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নেতা। পরবর্তীতে অবিভক্ত জেলারসম্পাদক, রাজ্যের যুগ্ম সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় সম্পাদক হওয়ার কারণেও ওনার পরামর্শ পেয়েছি। একটা ঘটনা বলি, ১৯৭৮সালের চিকিৎসার জন্য উনি মস্কো যান ফুসফুসের সমস্যার জন্য, চিকিৎসা করতে যাওয়ার সময় তিনি দিল্লিতে আমার কাছে ছিলেন, আমি তখন পার্লামেন্টের সদস্য। চিন্তিত ছিলাম বড় অপরেশন কিন্তু পরে কখনও তা নিয়ে শ্যামলদাকে

কথা বলতে দেখিনি। শরীরে অসুবিধা থাকলেও বেরোনোর পর সারাদিন তা নিয়ে উনি কখনো ভাবেননি।

সুবক্তা ছিলেন শ্যামলদা, শব্দচয়ন ছিল অসাধারণ–যেহেতু কবিতা পড়তেন আবৃত্তি করতেন তাই ব্যতিক্রমী ভাবেই ওই সমস্ত শব্দের ব্যবহার ছিল তাঁর অনায়াস দক্ষতা। শুধু তাই নয়, উপস্থাপনায় কখন উচ্চগ্রামে, কখন গলা নিচে নামিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করতে হবে তা তিনি জানতেন। সে যুগের আগুন ঝরানো বক্তা ছিলেন সুভাষদা,শ্যামলদা।অনুকরণ নয়, তবে ওঁদেরও রকম বক্তৃতা শুনতে পেরেছি বলেই পরে আমরাও খানিকটা শিখেছিলাম, ওঁদের অনুপ্রেরণা ছাড়া এটা হতো না। বেশ খানিকটা পরে ওনার ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত হওয়ার কথা, সেই কাজ খুব সহজ নয়! ছাত্র আন্দোলন, মন্ত্রী, ট্রেড ইউনিয়ন তিনটে তিন ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আলাদা। শ্রমিকের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানা না থাকলে শ্রমিকের সাহায্য করা যায় না,তা উনি আয়ত্ত করেছিলেন। জ্যোতিবাবু বললেন বিদ্যুতের সংকটের মধ্যে কর্মীরা যাতে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, তাতে ইউনিয়নের ভূমিকা থাকে সেটা দেখা দরকার–তা তিনি করলেন। বিদ্যুৎকর্মীদের সংগঠিত করলেন। পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে এক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন। রাজ্য সিটুর সভাপতি হিসেবে সমস্ত রকম সংঘটিত শিল্পকে সাহায্য করেছেন।

দুটো ঘটনা শ্যামলদা সম্বন্ধে না বললে ইতিহাস ক্ষমা করবেনা! সেটাই প্রথম হলো গ্রাম আর গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণ সম্বন্ধে ওনার তত্ব যা পরবর্তীতে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত হয়। আজ থেকে ১৬বছর আগের পরিস্থিতি যা ছিল তাতে আজ বোঝা যাবে না কেন প্রথমে তত্বকে সত্যতে পরিণত করতে এতটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ২০০৫সালে উনি কেরালায় চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন আমাকে যেতে হলো সঙ্গে। আমি যাই, সেই ফাঁকে আমারও চিকিৎসা হয়, কিন্তু সারা দিন অফুরন্ত সময়! উনি লিখলেন আর পড়ে চললেন। সেই সময় শ্রমজীবী জনগণের ৯৩ শতাংশ ছিলেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে একটা বিপুল অংশ কৃষিকাজ ছেড়ে এসেছেন, চরিত্র ছিল কৃষকের পরে হয়েছেন শ্রমিক। এটা অবশ্য

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন মহেশ গল্পে। গফুর আমিনার হাত ধরে যখন উলুবেড়িয়ার চটকলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তখনতো শ্রমিক হলেন কিন্তু যে গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষ আংশিক কাজ করলেও তার কিছুটা শ্রমিকের ভূমিকা পালন করেন, তাকে কিভাবে চিহ্নিত করা হবে কিভাবে সংঘটিত করবে নানান বিতর্কের পর ঠিক হলো গ্রামেও ট্রেড ইউনিয়ন করা ছাড়া বিকল্প নেই। ২০১১'র পরে যখন তৃণমূল সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, খুবই অসুবিধা হচ্ছিল আন্দলোনে, বিশেষত দিল্লিতে একটি ঘটনার পর সিপিআইএম কর্মীদের মারধর, প্রায় সাড়ে সতেরশ অফিস ভাঙচুর দখল করা হলো, সেই সময় দিশেহারা ভাব আন্দোলন গড়ে তোলা যাচ্ছে না তখন শ্যামলদার ভাবনাবিপিএমও - বেঙ্গল প্লাটফর্ম অফ মাস অরগানাইজেশন, যাতে সব গণসংগঠন ছাত্র- যুব- মহিলা -শ্রমিক-কৃষক অধ্যাপক -কর্মচারী সমস্ত স্তরের মানুষ সামিলহলো, মিলিত হলো পদযাত্রায়। এই যুক্ত মঞ্চ দম বন্ধ করা পরিবেশ কাটিয়ে নতুন ভাবে হেঁটেছে যা এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সকলে মিলে এটা সফল করেছিল বলে আতঙ্কের পরিবেশ কাটিয়ে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। আজকের ছাত্র নেতৃত্ব কর্মীদের ধন্যবাদ তারা এর মধ্যে দিয়ে একটা সময়কে ধরতে চেষ্টাকরেছেন।শ্যামলদাকে স্মরণ মানে শুধু একটা ছাত্রসংগ্রামের মধ্যেদিয়ে হবেনা ষাট সত্তরের দশকের যে আন্দোলন ছিল, ঘন অন্ধকারের মধ্যে আজকের আন্দোলন আশার আলো দেখাচ্ছে। তাকে সঠিক ভাবে বিকশিত করতে হলে অতীতের ছাত্র আন্দোলনকে বুঝতে হবে, আজকের ছাত্র আন্দোলন কখনই অতীতের অনুরূপ হবে না, একই ধারায় হবেনা তবে অতীতকে বুঝলে তবেই আজকের আন্দোলনে এগোতে সুবিধা হবে আর সেটা শ্যামলদা, সুভাষদা তাদের বাদ দিয়ে হবেনা।তাহলে আগামীর রূপ রেখা তৈরি করা যাবে না। একইভাবে আগামীদিনে গ্রামীণ শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে শ্যামলদার শেখানো পথেই এগোতে হবে, শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর মাধ্যমে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে

সোমনাথ ভট্টাচার্য

শ্যামল চক্রবর্তী ছিলেন বড় মাপের নেতা। রাজ্যের এক সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। দেশের সাংসদ। সিটুর সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এবং আরও আরও অনেক কিছু। আমার থেকে প্রায় সিকি শতাব্দী বয়োজ্যেষ্ঠ। এ হেন কাউকে কি বন্ধু বলে সম্বোধন করা উচিত? শ্যামলদাই শিখিয়েছিলেন। পার্টির বাইরের কারুর সঙ্গে পরিচয় করানোর সময় বলতেন, ‘‘আমার বন্ধু’’। একদিন জিজ্ঞেস করায় বুঝিয়ে ছিলেন ‘বন্ধু’ শব্দটির দ্যোতনা কী। তাই শ্যামলদার মৃত্যুর পর বারবার এই ভাওয়াইয়া গানের কলিগুলো মনের মধ্যে ফিরে ফিরে আসছে।

যদিও এই কাজল ভ্রমরাকে আর কোনদিনই বলতে পারব না, ‘‘কোন দিন আসিবেন বন্ধু ক’য়া যান, ক’য়া যান গো’’!

শ্যামলদা ছিলেন এক সহজাত চিন্তাশীল মানুষ। ভাবতে পারতেন, ভাবাতে পারতেন। কখনো কখনো সময়ের থেকে এগিয়ে ভেবেছেন। সবসময় চেষ্টা করতেন আগামী কালটাকে অনুধাবন করার। তার চিন্তার নদীটি ছিল স্রোতস্বিনী, বহমান। ফলে শ্যাওলা জমতে পারত না, কেবলই এগিয়ে যেত। সব্যসাচীর দু’হাত সমানভাবে চলে। শ্যামলদার মুখ এবং হাত সমান দক্ষতায় চলত। যেমন অসাধারণ বক্তৃতা করতেন, তেমনই অসামান্য সাবলীলভাবে লিখতেন। কঠিন বিষয়কে সহজভাবে বলার ও লেখার দুর্লভ মুন্সীয়ানা ছিল তার নখদর্পণে।

এই তো সেদিন ‘দেশ’ পত্রিকায় লেনিন নিয়ে লিখতে গিয়ে গল্পের ছলে বুঝিয়ে দিলেন ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের চরিত্রগত পার্থক্য কী। পড়ার সময় মনেই হবে না কত বড় তাত্ত্বিক প্রশ্নের তিনি অবতারণা করলেন।

বিষয় নির্বাচনেও তার রচনা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনো কাশ্মীর তো কখনো প্যালেস্তাইন। কখনো জাতপাত তো কখনো ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন। আর নিরলস কলম ধরেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে। তার লেখার পরতে পরতে অনায়াসে বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, রাম বসুরা। কঠিন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লিখছেন অথচ সাহিত্য রসে টইটুম্বুর।

নতুন কোন বিষয়ে ভাবতে শুরু করলে গবেষকের মন নিয়ে আতসকাচের নিচে রেখে যাচাই করতেন একের পর এক তথ্য। তুলে আনতেন নতুন নতুন সত্য। এভাবেই গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কিত এক অসামান্য দলিল তিনি রচনা করেন। যেখানে তার আগে কেউ কোন পদচিহ্ন রাখতে পারেনি। ভবিষ্যতেও কেউ সে কাজ করতে গেলে শ্যামল চক্রবর্তীর রচনাটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সবাই যখন এবিষয়ে আলোচনা করছেন তখন শ্যামলদা তা করে দেখালেন। তারই উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ করল এ দেশের প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের সংগঠন WBITSA তিনি গড়ে দিলেন কিন্তু কমিটিতে কোথাও থাকলেন না। অথচ ইটসা আপাদমস্তক ছিল শ্যামলময়। এটাই কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী।

তরুণ কমরেডদের প্রতি ছিল তার অপরিসীম ভালবাসা। নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতা; প্রশ্রয়, আশ্রয় ও শাসনে শ্যামল হৃদয় সবসময়েই উপছে পড়েছে। প্রশংসা করতেন সর্বসমক্ষে, সোচ্চারে, সোল্লাসে আর ভুলগুলো শুধরে দিতেন একান্ত নিভৃতে। কেউ যেন জানতে না পারে। স্নেহশীল পিতার মত।

সিআইটিইউ’তে স্বচক্ষে দেখেছি কী জেলা, কী রাজ্য কেউ কোথাও ঠেকে গেলেই শেষ আশ্রয় শ্যামল চক্রবর্তী। এই শব্দ ক’টা লিখতে লিখতেই আবার ভাওয়াইয়াটা বুকে মোচড় তুলে গেয়ে যায়, ‘‘বট বৃক্ষের ছায়া যেমন রে/মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে।...’’ সত্যিই তিনি বট গাছের মতনই ছায়া দিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন আমার এবং আমার মত অনেকের যথার্থ শিক্ষক। Friend, Philosopher and Guide.

বড় অসময়ে তুমি চলে গেলে শ্যামলদা। এখন তোমার যাওয়ার কথা ছিল না। আরো কয়েকটা বছর তোমার থাকাটা জরুরি ছিল।

আমরা যারা তোমার কাছ থেকে পেয়েছি অনেক অনেক অনেক তারা কিচ্ছু করতে পারিনি তোমার জন্যে। তোমার তৃষিত মুখে একটু জল দিতে পারিনি। উত্তপ্ত কপালে একটু হাত রাখতে পারিনি। হাতের মুঠোয় হাতটা ধরে বলতে পারিনি, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।’’

প্রাণের মানুষটার জন্য কিচ্ছুটি করতে না পারার বেদনা যে কত বড় তা বলবার নয়, শুধু অনুভবের।

শ্যামলদার মরদেহ লাল পতাকায় ঢেকে দিলেন সূর্য মিশ্র, শমীক লাহিড়ীরা। শেষ শ্রদ্ধা জানালো বুয়াসহ সমবেত কমরেডরা। শ্যামলদা জানতেও পারলেন না তার মৃতদেহকে সামনে রেখে এই ক’মাসে সমাজের বুকে গেঁড়ে বসা কত বড় STIGMA কে খানখান করে ভেঙে দিল তার Comrade in Arms রা।

স্লোগান উঠল : কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী অমর রহে।

কমিউনিস্টরা কোন অমরত্বের আওয়াজ তোলে? একি উপনিষদের মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়? মৃত্যুর থেকে অমরত্বে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা।

শাব্দিক অর্থ এক হলেও উপলব্ধিটা ভিন্ন। এ অমরত্বের জন্য কোন স্বর্গের প্রয়োজন নেই। এই মর্ত্যের মাটিতেই শ্যামল চক্রবর্তী বেঁচে থাকবেন অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে। কমরেডদের মনের মণিকোঠায়। প্রতিবাদের মিছিলে, প্রতিরোধের মিটিংয়ে জনতার মুখরিত সখ্যে।

আর আমরা তোমাকে খুঁজে পাব,

পদে পদে পথ চলার মাঝে,

কমরেডদের কথোপকথনে সংগঠনের কাজে।

তোমাকে পাব পিসি মিটিংয়ে দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষা চেয়ারটায়। সিটু অফিসের দোতলায় মাঝখানের ঘরে। পাবো বিদ্যুৎ ইউনিয়নের সম্মেলনে তোমার না থাকার বেদনায়। পাবো পয়লা মে শহীদ মিনারে অনুপস্থিতির তালিকায়। পাবো সম্মেলনের ফাঁকে তোমার নেতৃত্বে না হওয়া নির্ভেজাল আড্ডায়। পাবো এনবিএ-র প্রকাশনায়।

তোমাকে খুঁজে পাব শ্যামলের কথা উঠলেই বিমানদার বিষণ্ণ মুখ আর ছলছল চোখের বেদনায়। নতুন নাটক দেখতে যাবার উত্তেজনায়। ব্ল্যাক সিনেমার রিভিউয়ে গণশক্তির পেপার কাটিংয়ে।

''পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে'' তোমার কণ্ঠে আর শুনতে না পাবার কষ্টে খুঁজে পাব আমাদের প্রিয় শ্যামলদাকে।

এখানে-ওখানে-সেখানে, অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র তুমি ছিলে আজও আছো, ভবিষ্যতেও থাকবে। আর আমরা মনে মনে বলব, ''আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে।''

কাপ্তান সাহেব, আপনাকে

সারণ দত্ত

শ্যামল চক্রবর্তীর সাথে আমার আলাপ অভিনেতা চন্দন সেনের মাধ্যমে ২০০৮ সালের মাঝামাঝি। তার আগে ২০০৭ সালে নন্দীগ্রাম পরবর্তী প্রবল আক্রমনের প্রতিরোধে প্রয়াত কবি জয়দেব বসু, চন্দন সেন, আমি এবং আরেকজন (পেশাগত কারণে তার নামটা উল্লেখ করলাম না), শান্তি সংহতি নামে একটি মঞ্চ গড়েছিলাম। আলাপটা সেই সূত্র ধরেই।

প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উনি ধরলেন আমি মানুষটা শুনি কম এবং বলি বেশি। উনি আবার ঠিক উল্টোটা। আলাপচারিতার শেষ মাথায় উনি বললেন আমাদের বহু সমর্থক শিল্পী সাহিত্যিক আছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাঁরা খুব দিশেহারা বোধ করছেন। সবাইকে একজোট করার জন্য তূণীর বলে একটা সংগঠন তৈরি করেছি, তোমাকেও থাকতে হবে। সেই থেকে যাত্রা শুরু।

প্রবল ঝড়, প্রতিকূল স্রোত আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের সম্মুখীন একটা টালমাটাল জাহাজ। বামপন্থী শিল্পী সাহিত্যিক নাবিকেরা হিমশিম খাচ্ছেন আর জাহাজ ডোবার আশঙ্কায় একপাল ইঁদুর অনুকূল স্রোতে ঝাঁপ দিচ্ছে। এমন একটা সমসয় পোড় খাওয়া কাপ্তানের মত হাল ধরলেন শ্যামলদা। প্রতিটি শিল্পী যে আদপে একজন ব্যক্তি মানুষ সেটা বুঝতেন উনি। মন মর্জি মাফিক সৃষ্টি করাটা যাঁদের পেশা তাঁদের তাই কোন সংগঠিত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করার চেষ্টাও করেননি কোনদিন। জাহাজটা যে

ডোবেনি এতদস্বত্তেও, সেটা তার অন্যতম প্রধান কারণ। আস্তে ধীরে আরও অনেক মানুষ এসে ভিড়েছেন, যাঁরা এদিক সেদিক ভেসে যাচ্ছিলেন। ইনক্লুসিভ পলিটিক্স বলে একটা কথা আজকাল খুব শোনা যায়, শ্যামলদা সেটা হাতে কলমে শিখিয়েছিলেন আমাদের।

বামপন্থী নাগরিক সমাজ বলে আজ যেটা পশ্চিমবঙ্গ যানে সেটা গড়ার মূল কারিগর শ্যামল চক্রবর্তী। শুধু তূণীর নয়, সমকালিন সময়ে গড়ে ওঠা সম মনোভাবাপন্ন বাকি সংগঠনগুলিতেও যুক্ত করে নিতেন বার বার। এমনকি রাজধানীর ‘সহমত’র সাথেও আমরা যৌথভাবে কাজ করেছি। সিআইটিইউ’র অফিসে আগামী প্রোগ্রামের মিটিংগুলিতে সবার কথা সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন। সবটা যে গ্রহণ করতেন তা নয় কিন্তু বর্জনের ভঙ্গিটি এত মোলায়েম হত যে কারোর গায়ে লাগত না। প্রতিটি প্রোগ্রামের আগে ওনার উত্তেজনার রেশ ছুঁয়ে যেত আমাদের সবাইকে।

কোনদিন শুনিনি কোন পাবলিক মিটিং’এ পাঁচশোর কম চেয়ার বা কোন মিছিলে পাঁচ হাজারের কম মানুষ আনতে হবে। এবিষয়ে ওনার একটা ছেলেমানুষি জেদ ছিল। ছেলেমানুষি ছিল শ্যামলদার আরেকটি বিষয়েও। সেটা খাওয়াদাওয়া নিয়। তূণীরের বার্ষিক সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু কিংবা গৃহীত সিদ্ধান্তের মতই খাবারের প্যাকেটটাকেও সমান গুরুত্ব দিতেন।

শ্যামলদার ঘরে ওনার প্রাণখোলা হো হো হাসির আড্ডায় স্মৃতিচারণ করতেন মাঝে মধ্যেই। সেই স্মৃতিচারণায় কচ্চিৎ কদাচিৎ থাকতো ওনার অতীতের শিহরণ জাগানো বিপ্লবী কর্মকান্ড। বরং যৌবনের ছেলেমানুষি সুলভ ভুল ভ্রান্তিগুলি নিয়ে রসিকতা থাকতো অনেক বেশি। জ্যোতি বসুর কথা বলতেন বার বার আর আমাদের কান্ডজ্ঞান শেখাতেন, প্রয়োজনে নমনীয় হতে বলতেন। আজ এই বার বার করতেন, বলতেন, শুনতেন লিখতে লিখতে কলম যখন ঈষৎ ভারাক্রান্ত হঠাৎ মনে হল শুধু শ্যামলদার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করাটাই যথেষ্ট নয়। ওনার রাজনৈতিক যাপনটাকে সেলিব্রেট করাটা অনেক বেশি জরুরি। ওইটুকুই মনে রাখলাম কমরেড। তীরে ভিড়তে তরীর এখনও অনেকটা পথ বাকি।

বিদায় বলবো না

উষসী চক্রবর্তী

বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল একটাই। তাঁর দেহ যাতে দাহ করা না হয়। মিছিল করে যেন নিয়ে যাওয়া হাসপাতাল। প্রিয় কমরেড অনিল বিশ্বাসের মত যেন চিকিতসকা বিজ্ঞানের স্বার্থে দান করা হয় মরদেহ। শতরূপ আর বিপুলদাকে বারবার করে বলে রেখেছিলেন ‘আমার মেয়ে যদি অন্য কিছু বলে তোমরা শুনবে না। দাহ করবে না। সোজা মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাবে’।

আমার ‘অন্য কিছু’ বলার প্রশ্ন ছিল না। আমি জানতাম গোটা কলকাতায় মিছিল করে, ইন্টারন্যাশানাল গাইতে গাইতে কোনও একদিন আমরা বাবাকে মহা সমারোহে মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাব অন্তিম যাত্রায়। কিন্তু কোভিড তা হতে দিল না।

দিল না ঠিকই কিন্তু কতগুলো প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। মৃতদেহে একটি ভাইরাস সত্যিই কতক্ষণ বাঁচতে পারে এই নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য কি আছে? চিকিতসাবিজ্ঞানে কি এই নিয়ে কোনও গবেষণা হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে করা হোক। এমন যদি প্রমাণ হয় মৃতদেহে কয়েক ঘন্টা বা কয়েক মুহুর্তের পরে ভাইরাস আর বেঁচে থাকতে পারে না, তাহলে সেই সময়টুকু মৃতদেহ হাসপাতালে সংরক্ষিত রেখে, দরকার হয় প্যাকিং করেই তা তুলে দেওয়া হোক পরিবারের হাতে।

সচেতনতা থাকুক । মাস্ক থাকুক। স্যানিটাইজারও থাক। কিন্তু অযথা প্যানিক বন্ধ হোক ।

অনেকেই জানতে চাইছেন বাবাকে কি ভাবে মনে রাখব! আমি মনে রাখব একজন লড়াকু মানুষ হিসেবে। কল্লোল নাটক দেখতে দেখতে যিনি আমায় ফিসফিস করে বলেছিলেন 'লড়াইটাই আসল। প্রতিরোধ টাই জরুরী। জেতা-হারাটা নয়'। আর মনে রাখব যেকোনও প্রতিকুলতার মধ্যেও ওঁর মনের জোর না হারানোর 'ম্যাজিকাল' ক্ষমতার কথা।

আর মনে রাখব 'পার্টি হোল্টাইমার' হিসেবে ওঁর নিজস্ব গর্বের কথা।

কখনও বিধায়ক, কখনও মন্ত্রী কখনও বা সাংসদ- ওঁর অনেক পরিচয় ছিল। কিন্তু লোকের কাছে আমাদের সে সব বলার যো ছিল না। 'বাবা কি করেন' জানতে চাইলে বলতে হত একটাই কথা। 'বাবা পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। পার্টি হোল্টাইমার। আমরা হোল্টাইমার পরিবার'। ব্যাস আর কিচ্ছু না।

আমার মা সক্রিয় রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি করতেন। মা মারা যাওয়ার পর তাই আমাদের বেশ অনটনেই পড়তে হয়েছিল। সেই সময়ে সাড়ে আট টাকা মাইনে (প্লাস ৫ টাকা টিফিনের) দিয়ে কি ভাবে লেখাপড়া শিখে শেষ অবধি বি এ এম এ পাশ দিলাম সে কাহিনী আজকাল অনেকেরই রূপকথার মত শোনাবে। কিন্তু আমরা বাবা-মেয়ে খুব সহজেই এই জীবন মেনে নিয়েছিলাম।

অনমনীয় মনের জোর। মানুষের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষা আর ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও সৎ থেকে যাওয়ার জাদুমন্ত্র। আশাকরি এই সবের জন্যই উনি পরের প্রজন্মের সর্ব্বক্ষণের কর্মীদের কাছে উনি উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবেন।

যে মিছিল বাবা এত ভালবাসতেন সেই মিছিল করে বাবাকে বিদায় আমরা দিতে পারিনি ঠিকই কিন্তু সান্তনা একটাই - কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বাবার প্রিয়তম লাল পতাকায় তাঁকে মুড়ে দিয়েছেন বাবার কমরেডরা। আর আমরা সবাই গাইতে পেরেছি বাবার প্রিয়তম গান 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড, এস মোরা মিলি এক সাথ..গাও ইন্টারন্যাশানাল.. মিলাও মানবজাত...।'

লাল সেলাম কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী । মাঠে, ময়দানে, কলে, কারখানায়, মিছিলে স্লোগানে লড়াই জারি থাকবে।

জীবনরসিক

শময়িতা চক্রবর্তী

শ্যামলদা শোকবিহ্বল হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। আনখশির বস্তুবাদী মানুষ। তাছাড়াও জীবনের ভাঙাগড়ার মুহূর্তগুলোতে জ্যোতিবাবুর মতন স্টিফ-আপারলিপ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিলো সুভাষ চক্রবর্তী মারা যাওয়ার পর। বলেছিলেন, 'সাতদিন ধরে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সুভাষের কথা ভাবলেই জল পড়ছে। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব?' তিনটে অবিচুয়ারি লেখেন। তার মধ্যে অন্যতম, সুভাষ বন্ধু আমার, পড়ে একাধিক তাবড় স্টিফ-আপারলিপকে কাঁদতে দেখেছি।

সিনেমা থিয়েটারের মানুষদের প্রতি অদ্ভুত মুগ্ধতা ছিল। প্রায় ফ্যানবয় এর মতন কথা বলতেন। প্রায় সমবয়স্ক এক অভিনেতাকে বলেছিলেন, 'আমি ছোটবেলা থেকে আপনার ফ্যান'। আর ছিল একটা পরিষ্কার বোধ। সংকীর্ণতামুক্ত। গণসংগীত মেলার শেষে এক মিটিঙে কবির সুমনের রাজনৈতিক সমালোচনা শুনে বলেছিলেন, 'আমাদের রাজনীতির প্রতি ওনার তো কোনও দায় থাকার কথা নয় ।ওঁর সৃষ্টির মধ্যে যদি কখনো কোনও প্রগতিশীল কন্টেন্ট থাকে সেটাই আমাদের প্রাপ্তি, হাতিয়ার'।

আর খেতে ভালবাসতেন। ইলিশ। তেল কই। ইলিশের অ্যানেকডোট দিতে গিয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসের কথা বলেছিলেন। তখন থাকেন দমদম ক্যান্টনমেন্টে। ওপারের ইলিশ ভর্তি বরিশাল এক্সপ্রেস খারাপ হয়ে গেল দমদমে। পচে যাওয়ার ভয়ে জলের দরে

সে মাছ বিক্রি হল। উনিও কিনে আনলেন। ‘সেইবার এত ইলিশ খেয়েছিলাম যে আগামী সাতদিন ঘরের, জানলা, দরজা, দেওয়াল দিয়ে ইলিশের গন্ধ বেরচ্ছিল’, বলেছিলেন।

ভর্তি হলেন যেদিন, অর্ককে ফোনে বলেছিলেন ফিরে এসে তেল কই খাবেন। তেল কই , ইলিশ ভাপে , বা স্রেফ মুড়ি মাখা – খাওয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন উদারপন্থী।

ইংরেজি একটা কথা আছে – জেস্ট ইন লাইফ। জীবনরসিক। শ্যামলদা কানায় কানায় সেইরকম। ছিলেন লিখলাম না। কারণ এই মানুষের পাস্ট টেন্স হয় না।

শ্যামলদা এক আশ্চর্য বেঁচে থাকা

অর্ক রাজপন্ডিত

বছর তিনেক আগে দশমীর দুপুর। শ্যামলদার বাড়িতে বসে আমি আর বিপুলদা। শ্যামলদা আমাদের মাটন খাওয়াবেন। আড্ডা চলছে, বেলা গড়ায়।

খাওয়ার ডাক পড়ছে না কেন? শ্যামলদা একবার ঘর থেকে উঠে যাচ্ছেন আবার ফিরে আসছেন। খানিক পরে নিজেই বললেন, ‘আসলে বুঝলি বিরিয়ানিটা এই আবাসনের কমিটি রাতে দেবে, আমি ভেবেছিলাম সকালে। তাহলে ডাল আর বেগুন ভাজা দিয়েই শুরু হোক’।

এই হলেন শ্যামলদা। নির্মল হৃদয়, শিশুর সারল্য, নিষ্পাপ আকাশের মত মন। আমাদের মত আমাদের প্রজন্মের কম বয়সীদের সঙ্গেও মিশে যেতেন অনায়াসে।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে লেখার ক্ষমতা, স্পর্ধা আমার নেই। আমি যে আমার ‘শ্যামলদা’কে চিনি, যে শ্যামলদা আমার বা আমার মত অনেক কমরেডকে আক্ষরিক অর্থে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, তাঁর কথাই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে যখন চোখ শুষ্ক রাখা কঠিন।

শ্যামলদাকে আমি কোনদিন দু:খ পেতে দেখিনি অন্তত প্রকাশ করতে দেখেনি। শ্যামলদাকে আমি কখনো বিমর্ষ দেখিনি, যতবারই দেখা মনে হয় আমার থেকেও মনের বয়স ওঁর কম। সব সময় একগাল হাসি।

আমাদের গণশক্তি অফিস থেকে ঠিক এক দুই তিন করে দশ অবধি গুনলেই সিআইটিইউ অফিস। সপ্তাহে অন্তত একদিন বিকেল

হলেই শ্যামলদার ফোন আসতো, 'কোথায় রে তুই? সুদীপ্তকে নিয়ে চলে আয়, আড্ডা হচ্ছে না অনেকদিন'।

আমি আর সুদীপ্ত হাঁটতে শুরু করতাম। শেষ যেবার সিআইটিইউ অফিসে কয়েক ঘন্টা আমি আর সুদীপ্ত ওঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি চিকেন রোল না খাইয়ে ছাড়েননি। শ্যামলদা যেরকম ভালোবাসতেন খেতে সেরকম ভালোবাসতেন খাওয়াতে।

সুদীপ্ত আর আমি শ্যামলদার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই শ্যামলদার বই বা খবরের কাগজ বা কোন পত্রিকা নামিয়ে রেখে সেই হাসি। শ্যামলদাকে যেখানেই দেখেছি কখনো চুপচাপ অলস বসে থাকতে দেখিনি, কিছু না কিছু পড়ছেন সব সময়। একদিনও ব্যতিক্রম দেখিনি।

আমার মত একজন সাধারণ পার্টিকর্মীর কোনদিন মনে হয়নি উনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা, প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন মন্ত্রী। মনে হয়েছে বারে বারেই উনি ঠিক আমার বাবার মতই, যাঁকে সত্যিই প্রাণ খুলে সব বলা যায়, যাঁর সাথে যেকোন বিষয়ে প্রাণ খুলে আড্ডা মারা যায়, যাঁর পরামর্শ পাওয়া যায় সব সময়। এমনই শ্যামলদা আপন করে নিতেন এক লহমায়।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রচারে শ্যামলদা এসেছেন মালদহে, আমিও তখন বিধানসভা কেন্দ্র ধরে কভার করার জন্য মালদহে। শ্যামলদা জানতেন, মালদহ স্টেশনে ভোর বেলায় নেমেই ফোন, 'তুই চলে আয় আমার এখানে, তুই তো বেরিয়ে যাবি আয় সকালে চা টা একসাথে খাই'।

শ্যামলদার ফোন রেখে গেলাম ওখানে। শ্যামলদা বললেন ব্রেকফাস্ট দিতে, হোটেল কর্মী আমাকে লুচি সবজি দিয়ে গেলেন আর শ্যামলদাকে টোস্ট আর ডিম সেদ্ধ। শ্যামলদার হাসতে হাসতে ছদ্ম অভিমান, 'দেখলি অর্ক ইনজাস্টিসটা, ও আমাকে দেখেই ভাবছে লুচি সবজি আমার সহ্য হবে না'! শ্যামলদা, হোটেলের কর্মী আর আমি এবার তিনজন মিলেই হাসি।

পার্টির পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন। বিমানদা আর শ্যামলদা যাবেন সম্মেলনে, অফিস থেকে জেনেছিলাম আমারও যাওয়ার কথা

ওখানে সম্মেলন কভার করতে। যাওয়ার সময় একসঙ্গে যাওয়া হয়নি, আমি আর আমাদের ফোটোগ্রাফার কমরেড দিলীপ সেন গিয়েছিলাম ট্রেনে, বিমানদার গাড়িতে বিমানদা আর শ্যামলদা।

সকালে পুরুলিয়ার পুঞ্চা কলেজ, সম্মেলনের ভেনু ওখানে পৌঁছেই দেখি বিমানদা শ্যামলদাও পৌঁছেছেন। চলন্ত গাড়ি থেকে শ্যামলদার চিৎকার ‘এই তো অর্ক আর দিলীপ, উঠে পড় উঠে পড়’। পুঞ্চা শহরের কাছেই ছিল থাকার ব্যবস্থা, আমি আর শ্যামলদা এক ঘরে থাকবো এই ঠিক হল।

সম্মেলন শেষের পর সন্ধ্যাগুলিতে আমার কপি লেখা শেষ হলেই চলতো অনন্ত আড্ডা। মুহুর্তে শ্যামলদা চলে যেতেন তাঁর সময়ের পুরুলিয়াতে, তাঁর সময়ের ছাত্র আন্দেলনে, তাঁর সময়ের বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের কাজে। গল্পের মত রূপকথার মত শ্যামলদাদের সময়ের দিনলিপি শোনার সেই সব দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

সম্মেলনের পরের দিন সকালে উঠেই শ্যামলদা বললেন, ‘আজ তো রাতে সম্মেলন শেষ, তোদের ট্রেনে ফিরতে হবে না। বিমানদাতো রাতেই কলকাতা ফিরবেন, আমরা চল তোদের গণশক্তির দুর্গাপুর অফিসে আজ থাকি, কাল দুপুরে ওখানে বিপিএমও’র একটা মিটিং আছে, কাল সন্ধ্যে বেলা ওখান থেকে ফিরবো’। তরপরেই হেসে, ‘কি রে হাঁসের মাংস খাবি না কি? কমরেডরা খাওয়াবে বললো দুপুরে’!

শ্যামলদা ছিলেন জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে থাকা একজন মানুষ। শ্যামলদা ছিলেন ভয় ডরকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া একটা বিশাল মনের মানুষ।

শ্যামলদা ছিলেন সেই মানুষ যিনি হাসপাতালের বেড থেকে বলতে পারতেন ছুটি পেলেই বেশি করে লঙ্কা দিয়ে তেল কই খাওয়ার কথা।

শ্যামলদা ছিলেন সেই মানুষ নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরের মুহুর্তেই বলতে পারতেন, এত সহজ নয়। এটা পশ্চিমবাংলা, শেষ অবধি ওদের হারতে হবে। বিজেপি তৃণমূল কেউই বাংলাকে বোঝে না। আবার ভাবতে হবে রে, গোটা রাজ্যে বুথে বুথে মানুষকে আবার

নামতে হবে।

শ্যামলদা এক আশ্চর্য বেঁচে থাকা। শ্যামলদা এক আশ্চর্য জীবন যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোনদিন ভেঙে পড়া মানুষ ছিলেন না, হাসি মিলিয়ে যাওয়া মানুষ ছিলেন না, বিমর্ষ মানুষ ছিলেন না।

শ্যামলদা মানেই এক অর্থে ভীষন টাটকা বাতাস।

সেই শ্যামলদা আমাদের ছেড়ে কোথাও যাননি। আছেন, ছিলেন, থাকবেন।

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী লাল সেলাম।

দেহমৃত্যু অনিবার্য, বেঁচে থাকে কারও কারও ভাবনাধারা

আশিস চট্টোপাধ্যায়

শ্যামল চক্রবর্তী যেভাবে হঠাৎ চলে গেলেন, তা আমাদের অনেককেই বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। অবশিষ্ট জীবনের প্রতিদিন আপনাকে মিস করব, শ্যামলদা।

দেশভাগের যন্ত্রণা সঙ্গে করে দুখজাগানিয়া হয়ে বাঁচতে চাননি শ্যামলদা, দুখতাড়ানিয়া হতে চেয়েছিলেন। মার্কসবাদ তাঁকে সেই মন্ত্র দিয়েছিল।

শ্যামল চক্রবর্তী এককথায় অসাধারণ। কেন? মার্কসবাদের একটা অসুখ আছে। খুবই বড়সড় অসুখ সেটা। অসুখটার নাম, মার্কসবাদকে আপ্তবাক্যে পরিণত করে ফেলা। সেই অসুখের ফেরেই দেশে দেশে একেকটা আস্ত সংগঠন, দলের বিষম বিপদ হয়েছে। ভোট কম পেলেই যে দল হারিয়ে গেল, এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। ফিরে আসার অনেক উদাহরণ আছে, এ রাজ্যেও আবার প্রবল হয়ে ফিরে আসার উপাদান ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। কিন্তু সেই ফিরে আসার পথটাকে চওড়া করতে চাই পরিস্থিতিকে যতটা সম্ভব বোঝা, নিজের মূল লক্ষ্যে অবিচল থেকে প্রয়োজনে কৌশল বদলানো।

সময় স্থবির নয়, জঙ্গম। বহতা নদীর মতো। এই সূক্ষ্ম বোধের খামতি হলে মার্কসবাদ শক্তিমান থাকে না, ক্রমেই তেজ হারিয়ে মৃত স্মৃতিতে পরিণত হয়। জঙ্গম জীবনের প্রবহমান রসে এ রাজ্যে যেসব

মার্কসবাদীরা নিজেদের জারিত করতেন প্রতি মুহূর্তে, তাঁদেরই অগ্রগণ্য সেনাপতি শ্যামলদা।

শ্যামল চক্রবর্তী সিপিআইএম-এর সদস্যপদ পেয়েছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট দলে। সে এক ঝোড়ো সময়। চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষ, দলে মত ও পথ নিয়ে নানা মতবৈর, ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সঠিক দল গড়ার। সেই প্রথম যৌবনেও ভুল করেননি শ্যামলদা, বেছে নিয়েছিলেন ঠিক দলকেই – সিপিআইএম-ই তাঁর বাকি জীবনের একমাত্র সম্পদ হয়ে থেকেছে। অন্ধকারময় সত্তরের দশকের প্রথম সাত বছর, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি। শ্যামলদাছিলেন অবিচলিত। ওইরকম সময়েই, যতদূর মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। চোখ খুলে জগতকে দেখতে শিখিয়েছিলেন যাঁরা, শ্যামলদা তাঁদেরই অন্যতম প্রধান সেনাপতি।

দল রাজ্যে ক্ষমতায় এল ১৯৭৭ সালে। অজানা পথ। ভাবাহয়েছিল একরকম, হচ্ছিল নানারকম। কে ভেবেছিল, কেন্দ্রের জনতা সরকার পড়ে যাবে অত তাড়াতাড়ি? ফিরিয়ে নেওয়া হবে মোরারজি সরকারকে দেওয়া সিপিআইএম-এর সমর্থন? কে ১৯৭৭ সালে ভেবেছিল, ১৯৮০ সালে আবার ওই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরবেন ইন্দিরা? ফিরলেনই যখন, কে ভেবেছিল, টিকে যাবে বামফ্রন্ট সরকার, ফেলে দেওয়া হবে না? কিন্তু টিকে গেল। ১৯৮৪, ১৯৮৯ নানা পরিস্থিতি। তখন দেশে চালু লাইসেন্স-পারমিট রাজ, মাশুল সমীকরণের নীতি। এসবের ফলে, আর কেন্দ্রের রাজনৈতিক বিরোধিতায় রাজ্য পিছিয়ে পড়ছিল শিল্পস্থাপনে। ১৯৯১ থেকে কেন্দ্রীয় নীতির কিছু পরিবর্তনের ফলে জ্যোতি বসু ও অন্যরা ১৯৯৪-এ ভেবেছিলেন নতুন শিল্পনীতির কথা। তা নিয়ে দলে নানা মত। এসে গেল ১৯৯৬, ভারতীয় রাজনীতির এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে বহু অ-বিজেপি দল জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। সিপিআইএম তা মানেনি। তা নিয়েও দলে নানা মত। ভারতে সংসদীয় রাজনীতির গুরুত্ব কতটা, এ বিষয়ে নানা দোলাচল এসেছে বাম আন্দোলনে। এসব নানা বাঁক ও মোড়ে প্রায়

সব সময়েই জ্যোতি বসু যে কথাটা বলেছেন, সেটাই টিকে গিয়েছে সময়ের কষ্টিপাথরে। সেটা একটা বিচারধারা, মার্কসবাদী বিচারধারা। জ্যোতি বসুর প্রয়াণের পরে সেই চিন্তাপথের অন্যতম শেষ জীবিত সেনাপতি ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী, তিনিও চলে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়া বা না-হওয়া নিয়ে বাস্তব রাজনীতির মুহূর্ত যখন অতীতে পর্যবসিত, তখনই জ্যোতি বসু বলেছিলেন, ঐতিহাসিক ভুল। কেন? সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পেশ করে যাবার জন্য। একই মতের সেনাপতি শ্যামল চক্রবর্তী তেমনই অনেক কথা বলেছেন, লিখেছেন, গণশক্তিতে, বইপত্রে, ম্যাগাজিনে। সে ভাবনাগুলো যেন হারিয়ে না যায়। নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গ, মতামত, বিবরণী যদি রক্ষা করতে পারা যায়, সেটাই হবে শ্যামল চক্রবর্তীর প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ। একটু খেয়াল রাখতে হবে, ফুলমালায় যেন মুখটাই চাপা পড়ে না যায়।

ধোয়াঁশার মধ্যে যে শ্যামল উজ্জ্বল

আজিজুল হক

“মনে জেনো, জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ--
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য,
সকলি আহুতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিঁকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিঁকাতে।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে।”

শ্যামলের চিতাভস্ম যে কথা বলতে চায় সেটা বোঝার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে এই তথাকথিত “নিও-নরমাল” অবস্থা ও অবস্থান। যার মূল দর্শন হলো তফাৎ থাকো। চার গজ থেকে ছ ‘গজ তফাৎ থাকো। শ্যামল এবং আমরা যখন রাজনীতি শুরু করেছিলাম তখন ছিল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ো, অন্তরে অন্তর দিয়ে পরস্পরের পরিচয় জানো, সুখ না হলেও অন্যের দুঃখ ভাগ করে নাও। আজ শ্যামল যখন তার ষাট বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন শেষ করল, তখন বিজ্ঞান চর্চা এবং চর্যার নামে স্লোগান হয়ে উঠেছে তফাৎ যাও! একটা অবান্তর, অশ্লীল শব্দ। নর্মাল মানে যদি বাস্তবতা হয় তাহলে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যা কিছু আছে তার সবই নরমাল। “নিও-নরমাল” আবার কী! তাহলে কি শ্যামল শুরু করেছিল কোনো অ্যাবনরমাল যুগে ? শেষ করলো নিও-নরমালে? ৮টার সময় ৮টা বাজে ৯টার সময় ৯টা। নটার সময় বলিনা ৮টা নিও -নরমাল !

গত শতাব্দীতে নয় নয় করে আঠারোটা অতিমারী হয়েছে। যার মধ্যেও মানুষ সৃষ্টি করে গেছে অবিরত। সেগুলোকে পরাজিত করেই মানুষ এগিয়ে গেছে। অদৃশ্য শত্রুদের পরাজিত করেই ঘটে গেছে ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে রুশ বিপ্লব হয়ে ভিয়েতনাম বিপ্লবের মতো মহান সব পরিবর্তন। পৃথিবীর রঙটাই গিয়েছিলো পাল্টে। কোনো মারী-অতিমারীই রোধ করতে পারেনি শিল্প-সংস্কৃতির মহান বিজয়কে। কামুর ‘প্লেগ’, আজও অতিমারীর বিরুদ্ধে মানুষের আবেগ-ভালোবাসা এমনকী ঘরে ফেরার ইচ্ছেটাও তুলে ধরে, কোনও

মহামারীই পারেনি কামুর কলমকে থামাতে।

মন্বন্তরজয়ী, মারীবিজয়ী মানবজাতি! বারবার পাল্টে দিয়েছে মানুষের 'ভাগ্য'। যুদ্ধ ডেকে এনেছে মন্বন্তর... মন্বন্তর এনেছে 'মারী'... প্রতিটি মহামারীর আড়ালেই দেখা গেছে এই মন্বন্তর এবং খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযন্ত্রণার সংগ্রামকে শেষ করে দেওয়ার কৃত্রিম চেষ্টার এক অদ্ভুত সম্পর্ক। যার ফলে ধ্বংস হতে থাকে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য--অণুজীব, অতিকায় জীব প্রত্যেকেই আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বেঁচে থাকার তাগিদে, হাতি বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে...ধ্বংস হয় জনপদ, অণুজীবরা 'হোস্ট' ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, পরিবর্তিত হয়ে টিঁকে থাকার জন্যে। মানুষের লোভই প্রাথমিক ভাবে এই সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী।তাই, যা কিছুই হোক না কেন, শ্যামল এবং আমরা যে যুগে রাজনীতি শুরু করেছিলাম, সে যুগে এই প্রশ্নটাই তুলে ধরতাম, যে কোনো লেখা -কথা-কাজকে সবসময় প্রশ্ন করবে, "Who stands to gain?" ... কার লাভ হচ্ছে, কে লাভবান হতে পারে --এর উত্তরের ওপরেই নির্ভর করে একটা মতাদর্শ। অর্থাৎ, আমরা যেখানে শুরু করেছিলাম, আজ সেটাই মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান করার দাবি নিয়েই শ্যামলের চিতাভস্ম শেষ কথা বলছে...

'বাস্তব', 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি' ইত্যাদি নানা কথার মধ্যে দিয়ে যাই ঘটুক না কেন, বাংলার বামপন্থী আন্দোলনের সুবর্ণময় যুগ বলতে '৫৯ থেকে পরবর্তী এক দশককে বোঝায় যখন বাংলা বামপন্থী আন্দোলন একটা অন্যদিকে মোড় নেয়। গত শতাব্দীর ৬০-র দশককে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন যুব বিদ্রোহের যুগ হিসেবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই যুগটা ছিল মতাদর্শগতভাবে নিজেদের গড়ে নেওয়ার যুগও। '৫৯ সালের মহান খাদ্য আন্দোলন বাংলার ছাত্র সমাজের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় – ছাত্র আন্দোলন কোন পথে চলবে! ছাত্র আন্দোলন কি কেবলমাত্র ছাত্রদের স্বার্থেই পরিচালিত হবে ? বিভিন্ন মৌসুমী দাবি, যেমন ফি বৃদ্ধি, ভর্তির সমস্যা, হোস্টেল ব্যবস্থা, চাকরি ইত্যাদির মধ্যেই ঘুরপাক খাবে ? নাকি ছাত্র -যুবদের সামনে অন্য পথও আছে? '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের সমর্থনে ছাত্রদের মিছিল, ধর্মঘট এবং বিভূতিদা সহ ছাত্রদের শহীদ হওয়া এই প্রশ্নগুলোকেই আরো প্রকট করে তোলে, উদ্বেলিত করে ছাত্রসমাজকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই একই সময়ে এর বিপরীত তত্ত্বগুলোও চলে এসেছে অনুষঙ্গী হিসেবে। অর্থাৎ, যে মতাদর্শ বাস্তবকে শুধু ব্যাখ্যা করাই নয়, পাল্টানোর জন্যেও নিয়োজিত, সেই মতাদর্শ যখন ছাত্রসমাজকে নাড়া দেয়, তখন তার বিপরীত তত্ত্ব হিসেবে একটা কথাই জন্ম নেয় --'ভুল'...ভুল'...ভুল', অর্থাৎ একটা 'ভুল'-এর দৈত্যকে ছাত্র-যুব আন্দোলনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। তত্ত্ব এসে হাজির হয় ছাত্রদের নিজস্ব কোনো সংগঠন থাকবে না, এবং তা আসে কমিউনিস্ট পার্টির যারা মূলধারার শুধু নয় একমাত্র অংশ যারা ছাত্রদের চিন্তাজগৎকে নিয়ন্ত্রণ

করতেন সেটারই মাথা থেকে। ছাত্রদের নিজস্ব কোনো সংগঠন থাকবে না, সবাইকেই শাসক শ্রেণীর মূল সংগঠন NUS-র মধ্যে থেকে ছোট ছোট গ্রুপ গড়ে তুলতে হবে। এ সবই এলো ছাত্রদের ব্যাপক ঐক্যের নাম করে, – চূড়ান্ত বিলুপ্তবাদী লাইন হিসেবে। এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র-যুবরা তো বটেই, বাংলার ছাত্র ফেডারেশনও এই ধরণের চিন্তার সোচ্চার বিরোধিতায় নামে। ফলে যে দুটি ধারা তৈরি হল তারা

১) বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেই একাংশ দেশ এবং জাতির জন্য ছাত্র আন্দোলনের বর্শাফলককে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট করে স্বতন্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিক এবং মেহনতী জনতার পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

২) আরেকাংশ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয় অথচ নিজস্ব সংগঠন না গড়ে শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর সংগঠনের ভেতরেই ছোট ছোট কমিউনিষ্ট গ্রুপ গড়ে তোলা।

অর্থাৎ, ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন হিসেবে ছাত্র ফেডারেশন থাকবে নাকি তা বিলোপ করে এনইউএস-র মাধ্যমেই কাজ করতে হবে। এই দুই ধারার সংগ্রাম ছাত্র আন্দোলনের বিন্যাসের মতাদর্শের সামনে এসে হাজির হয়ে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিস্তারিতের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় মতাদর্শের জগতে ছাত্র আন্দোলনের বিন্যাসের এই লড়াইয়ে বাংলার ছাত্র ফেডারেশন এই বিলুপ্তবাদীদের কার্যত পর্যুদস্ত করে। এই সময় আমরা দেখি আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে ঘিরে যে বিতর্ক তার ঢেউ এসে পড়ে এ দেশের ছাত্র আন্দোলনের ওপর। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে তখন চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে পাল্টানোর মত ও পথ নিয়ে মহাবিতর্ক। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এই মতাদর্শগত সংগ্রামে বিশ্ব কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি চিহ্নিত হতে থাকে দুরকম ভাবে- একদল যারা মনে করেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ফ্রন্ট গড়েই দেশে দেশে শাসকদের পরাজিত করা সম্ভব। আরেক দল মনে করে তথাকথিত গণতন্ত্রের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আইনসভা এবং সংসদকে দখল করে একটা দেশের বাস্তব অবস্থা পাল্টানো যায়। এই দুই দলের সংগ্রাম যখন তীব্র তখন আরো একটি দল সৃষ্টি হয়, যাঁরা মনে করতেন সংসদ এবং সংসদ বর্হিভুত এই দুইয়েরই প্রয়োজন আছে।

এক কথায় বলা যায় সে ছিল এক অদ্ভুত সময়, এক অদ্ভুত উত্তেজনা- যখন শ্যামল চক্রবর্তীরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ছাত্রফ্রন্টের বিলুপ্তবাদের বিরুদ্ধে। যদিও উত্তর কলকাতায় ছাত্র পার্টি গ্রপের নেতৃত্বে তারাই আবার প্রতুল লাহিড়ীদের অনুগামী ছিলেন!

৬২ সালে ভারতে চীন আক্রমনের ফলে এদেশের কমিউনিস্টদের ওপরে যে

ব্যপক ধড়পাকড় ও নির্যাতন নেমে আসে তার বিরুদ্ধে বন্দীমুক্তি সহ একাধিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হতে থাকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে। ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলে সেই সময় গ্রেপ্তার হন ছাত্র আন্দোলনের বেশ কিছু কর্মী ও নেতা।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই মহা বিতর্কের ঢেউ ছাত্র আন্দোলনেও এসে পড়ে। বন্দীমুক্তির পর ১৯৬৩ সালে ছাত্র সংগঠন বিপিএসএফ কার্যত দুভাগ হয়ে যায়। বিপিএসফ'র সম্পাদক সদ্য মুক্ত নন্দগোপাল ভট্টাচার্য এবং প্রেসিডেন্ট গুরুদাস দাশগুপ্ত সহ নেতৃত্বের প্রায় গোটা অংশটাই একদিকে চলে যায়। অন্য দিকে মধ্যস্তরীয় সংগঠক এবং কলেজগুলোর ওপর সক্রিয় প্রভাবশালী নেতা এবং কর্মীরা যায়। শেষোক্ত দল ছাত্র ফেডারেশন (লেফট) নামে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে এবং বিপিএসএফ'র স্থায়ী ঠিকানা ১৮৬ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটের পরিবর্তে উদ্বাস্তু আন্দোলনের কার্যকরি অফিস ৯৩/১এ বউবাজার স্ট্রিটে নিজেদের অঘোষিত স্থায়ী কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, মতাদর্শগত ভাবে এবং রাজনৈতিক ভাবে পার্টি বিভক্ত হওয়ার অনেক আগেই গণসংগঠন ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ, সেই দিন বাংলার ছাত্ররা মতাদর্শগতভাবে কিন্তু বামপন্থা মানে স্রোতের বিরুদ্ধে চলাকে নিজদের কর্মপদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে।

শ্যামল চক্রবর্তীর 'চিতাশেষের ছাই' এই সত্যটাই বার বার হাজির করার চেষ্টা করে চলেছে – প্রশাসনিক কর্তা শ্যামল চক্রবর্তী নয়, মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী নয়..ছাত্রযুবদের একটাই লক্ষ্য, উজানে সাঁতার কাটা..তারই নাম বামপন্থা: 'It is an infinite joy to swim against current" এই সাঁতার মধ্য দিয়েই প্রচুর জল খেয়ে শ্যামল চক্রবর্তীদের জন্ম হয়। এখানে কোন শর্ট কাট রাস্তা নেই। এই পথেই শিপ্রাকে নিজের সহধর্মিনী হিসাবে সে পায় এবং এখানেই আমাদের এক অদ্ভুত একাত্মতা গড়ো ওঠে, আর সেটাই ছিল মানবিক 'নর্মাল'। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ো..অন্তরকে অন্তর দিয়ে জানো..প্রত্যেকের জীবনটাই ছিল খোলা খাতার মত। ৭৯/১এ বউবাজার স্ট্রিট কার্যত সকাল ১১টা থেকেই যৌবনের ভিড়ে গমগম করত। গানবাজনা, রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজের নীতিকৌশল নির্ধারণ, রঙ্গ রসিকতা..ব্যস্ত থাকতেন প্রত্যেকেই। এর মধ্যে যখনই কোন খবর আসত- ছাত্ররা পথ অবরোধ করেছে, প্রিন্সিপাল ঘেরাও হয়েছেন বা রাস্তায় বাস চালানো হয়েছে, দীনেশদা (মজুমদার) তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলতেন, 'খোঁজ নাও তো, চার চক্রবর্তী কোথায়!' এখানে ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়া দরকার। বউবাজার স্ট্রিটের অফিসে শ্যামল চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, প্রশান্ত চক্রবর্তী এবং আজিজুল হকের নিজস্ব অস্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। তা এমনই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে দীনেশদা বলতেন আজিজুলকেও এবার থেকে চক্রবর্তী বলে ডাকবো। ফলত: এটা সুখ্যাতি লাভ

করে চার চক্রবর্তী-র জোট হিসাবে। দীনেশদার কল্যানে আজিজুল হকও হল চক্রবর্তী..A Gang of Four chakraborty(s)! এর মধ্যে তিন চক্রবর্তী চলে গেল হয়তো শেষ হয়ে গিয়ে তাদের চিতাভস্ম যে কথা বলছে, তোর ওপরেই দায়িত্ব রইলো ছাত্রদের এবং বাংলার যৌবনের, অভিমানের তারা ছাড়লেও তুই তাদের ছাড়িস না। দীনেশদার 'চার চক্রবর্তী' এর শেষ জন হিসাবে আমাকে লিখতে হচ্ছে শ্যামলের কথা...। ইতিহাসের মৌলিক সত্য হল All will die and new will forget…

শ্যামল চক্রবর্তী

জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ মৃত্যু ৬ আগস্ট ২০২০

ঋণ স্বীকার: প্রচ্ছদ- ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী, অক্ষরবিন্যাস- তনয় পাল